হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা

৯ম পর্ব

দিগন্ত বড়ুয়া

৮ম পর্বের পর...

এই কয়দিনে দেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের দুর্গা প্রতিমা যে হারে ভেঙ্গেছে তার গড় হার গত বছরের চেয়ে প্রায় ১৭ গুন বেশী। আরো কিছু তথ্য হয়তো পাবো বলে আশা করি। দুর্গা প্রতিমা ভাঙ্গা একশ্রেনীর মুসলিমের জন্য অতি করণীয় কাজ। তা করতেই প্রতি বছর এই কাজ করেন আনন্দের সহিত। মুসলিম বলায় হয়তো মৌলবাদী মুসলিমেরা এখন তেড়ে উঠবে। তবে এই মুর্তি গুলো কি হিন্দুরা বা অন্যান্যরা ভাঙ্গে? আমি যত টুকু পারি তথ্য সংগ্রহ করি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের। শখে নয়, কোনো উদ্যেশ্যেও নয়। নিজেদের অবস্থান কি বাংলাদেশে তা নিজে নিজে মাপার ইচ্ছায়। গত কিছু বছর ধরে বাংলাদেশে মুসলিম মৌলবাদীরা বিভিন্ন আক্রমন, গুপ্ত হত্যা, বোমা ফাটানো সহ বিভিন্ন ক্রাইম করছে গোপনে বা ছদ্ম আড়ালে থেকে। এই কথা হয়তো সাধারণ মানুষেরা সবাই জানলেও যোশ ওয়ালারা জানে না বলে মনে হয় , কিছুদিন আগে পুর্ব এশিয়ার কোনো এক সংবাদ সংস্থা কতৃক প্রকাশিত হিসাব অনুষারে দেখলাম বাংলাদেশে মোট ছোট বড় মিলিয়ে আনুমানিক ৫৮টি জঙ্গী সংঘটন আছে, বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম বলেছেন ৪৮ টি জঙ্গী সংঘটনের কথা। তাদের মুল লক্ষ্য বাংলাদেশে আল্লার আইন প্রতিস্টা করা। এদের নিরব মদদ দাতা বাংলাদেশ সরকার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকার ও সরকারের কিছু অংশ তাদের আর্থিক সহায়তা করে। এই কথা পুর্ব এশিয়ার কাগজ যেমন বলেছেন তেমনি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কাগজ ও বলে থাকেন। এ কথা গুলো মাঝে মাঝে কাগজে প্রকাশ ও হয়, যেমন ৬/১০/০৩ এ একটি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে যে, জঙ্গীদের আশ্রয় নিরাপত্তা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে সরকার। বাকী অর্থ আসে আরব ও পাকিস্তান থেকে। এটা আমার মাত্র ৫ দিন আগের সংগৃহিত, এক ইংরেজী কাগজে লেখকের সাথে পরিচয়। তিনি দক্ষিন ও দক্ষিন পূর্ব এশিয়া বিষয়ক লেখক। তার মতে, ইদানিং মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে মাঝে মাঝে বিশাল অঙ্কের কিছু অর্থ আসছে বলে ধারণা এই জঙ্গীদের কাছে। সুত্র মতে ঐ দুই দেশে কিছু মানুষ ব্যবসায়িক ভাবে কিছু লেনা দেনা করছে বাংলাদেশের জঙ্গীদের সাথে। এই লেনদেনের মাধ্যম বাংলাদেশের কিছু ব্যবসায়ী। এই ব্যবসায়ীরাও জঙ্গী দলের সদস্য। লাভের পুরো টাকা জঙ্গী তৎপরতায় ব্যবহার হয় বলে সুত্র দাতাদের ধারণা। তবে সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি কেননা, বর্তমানে বাংলাদেশে জঙ্গীদের যে হারে তৎপরতা বেড়েছে তাতে সত্য বলে মেনে না নিয়ে উপায় কি ? কেননা, গত মাস দুয়েকের বাংলা কাগজে প্রায় প্রত্যেক দিনইতো দেখছি জঙ্গী ধরছে জিজ্ঞাসাদ করছে, কয়দিন পরে সেই খবর পাথর চাপায় চলে যাচ্ছে। ভারতের দিল্লী অঞ্চলের কোনো এক মাসিক কাগজ এক উপাত্ত হাজির করেছেন গত জুন মাসে। তার অনুষারে আরবের দেয়া বাংলাদেশী জঙ্গীদের জঙ্গী তৎপরতা চালাবার কিছু টাকা কেটেনিয়ে ভারতে মৌলবাদী উন্মাদনা বৃদ্ধির জন্য দেয়া

হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাই এই অভিযোগ যদি সত্যি হয় তবে ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশের জঙ্গীদের কাছে অর্থ সরবরাহ টা আরো বিস্বস্ত করে তোলে।

আধুনিক পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলোর বিশেষ করে মুসলিম প্রধান দেশ গুলো ক্রমান্বয়ে নিম্ন মুখী। আমার মাথা ব্যথা নাই। মুসলিম প্রধান দেশ নিচে জাক বা উপরে উঠুক তাতে আমার মাথা ব্যথা না থাকার কারণ হলো চৌদ্দশ বছরের পুরানো ধ্যান ধারণার মানুষ গুলোর সাথে আমাদের মত ছা পোষা মানুষের সাথে মিলবেনা। আমি আধুনিক যুগের মানুষ। ২০০৩ সালের মানুষ আমি। মনে প্রাণে হতেও চাই ২০০৩ সালের মানুষ।

আমার পরিচিতা প্রতিবেশীনি বীথি সেদিন আমাকে ফোন করে বললো দিগন্ত পারলে বাসায় এসে একবার আড্ডা দিয়ে যা। তোর জন্য একটা খবর রেখেছি। আমি বেশ অবাক হলাম। এই কথা শুনে আমি বললাম সন্ধ্যায় রেডী থাকবি। আমি এসে তোকে নিয়ে বের হবো। সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি সুস্মিতা নামের আমার অতিব পরিচিতা মহিলার সাথে বসে বিথী আড্ডা দিচ্ছে। আমি গিয়ে বললাম কিরে আমি তোরে বললাম রেডী থাকতে আর তুই আড্ডা দিচ্ছিস। উল্লেক্ষ্য বীথি, রায়দা ও সুস্মিতা একই প্রতিষ্টানে বিভিন্ন বিভাগে একই পেশায় কাজ করে।

বীথি কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ায়। পুরো নাম মাহমুদা আক্তার। তার মতে ইতিহাস হলো মরা মানুষের কথা, তথ্য সম্বলিত দলিল। সে বলে আজকে কি হচ্ছে তা নিয়ে ভাব, গত কালের ভাবনা দিয়ে কি হবে ? তবে গত কাল থেকে যা শিখেছিস তা কাজে লাগা। প্রতিদিন একটি ভালো কাজ কর, প্রতিদিন একটু ভালোবাসা দে কাউকে না কাউকে, দেখবি তোর প্রিয় আঙ্গিনা ভরে উঠবে আনন্দে। চিরকুমারী এই মহিলার কথাটা মন্দ নয়। এই তিনিই আমাকে বলেছেন আজকের দুটি ঘটনার কথা লিখতে। আজকের দিনের এই শিক্ষিকা সেদিনের কোনো এক যুবতি । শিক্ষা জীবনের কোনো এক সময় কোন এক সিনিয়র ছাত্রের প্রেমে পরে। যার সাথে প্রেম হয় সে আজকের বাংলাদেশে কোনো যোশ বাহীনির প্রায় প্রধান। সংসদ সদস্য ও হয়েছে কয়েকবার। বঙ্গদেশের শিক্ষা সমাপ্ত করে কাজ নেয়। কিন্ত যোশ ওয়ালারা বে পর্দা জেনানা বৌ করে ঘরে তুলবেনা। ব্যাস, মহিলাও বলে দেয় পড়ালেখা করেছি তা কাজে লাগাবার জন্য, বাড়িতে লুকিয়ে থাকার জন্য নয়। প্রখর ভালোবাসার জন্য হোক বা যে জন্যই হোক তিনি আর বিয়ে করেননি। অপর দিকে তার সেইদিনের প্রেমিক পুরুষ আজকের দিনটি পয্যন্ত দুই জোরা বিয়ে করেছে । কোনো বিয়ে ঘোষিত আবার কোনোটা এখনো অ-ঘোষিত। এই মানব প্রেম ,এই সমাজ জীবন যোশ বাহীনির । এ ভাবেই বেঁচে আছে যোশের কবলে, যেখানে জীবন হয় প্রতিক্ষন পদদলিত।কেউ হয়তো যুক্তি দিতে চাইবে এটা ভিন্ন বা কোন সাধারণ ব্যাপার। আমি বলবো, না, এটা সাধারণ নয়, যে ভাবে যোশ ওয়ালারা দেখে এসেছে তাদের সমাজ জীবন সেই ভাবেই তারা পরিচালিত হচ্ছে, তার ধারা বজায় রাখছে।

অন্য যে কথাটা লিখতে বলেছেন তার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন আজ থেকে বছর খানেক আগে। ঘটনাটা এরকম, অজ পাড়াগাঁ থেকে উঠে আসা পরিবার। যুদ্ধের বাজারে

কাঁচা মাল কামানো নব্য ধনী। ঢাকায় বসবাস। ছেলে বি এ পাশ দিয়ে বৈদেশ করতে এসেছিল। এসে এখানে কাজ নেয় ঝাড়ুদারের। এখানকার কোনো এক নাম করা (এক কথায় এই দেশের সর্ব বৃহৎ) টেলি যোগাযোগ কম্পানীতেই ঝাড়ুদারের কাজ করতো। এই ঝাড়ুদাররা নিয়োগ হতো অন্য কোনো ক্লিনিং কম্পানীকে কন্ট্রাক্ট দিয়ে। তাই এই বড় সর টেলি আপিস ভবনে প্রবেশের জন্য আই ডি দেয়া হয়। আই ডি তে লেখা থাকে কন্ট্রাক্টর, আর যার যার নাম ও ছবি। ছেলেটি কোনো একবার দেশে যায় বিয়ে করতে। বিয়ের বাজারে ধরা খায় এই মহিলাটি ও তার পরিবার। প্রচলিত সমাজের প্রতিষ্টিত কোনো মা বাবার মেয়ে। পরিচিতি ও কম নয়। ছেলেটি দেশে গিয়ে তার সেই কন্ট্রাক্টর লেখা কার্ডটি দেখায় বিয়ের কথার সময়। দেশে দেখছেন ছেলের মা বাবার অনেক পয়সা, তার উপর ছেলে বিদেশে ঠিকাদার। এমন ভালো পাত্র তো হাত ছাড়া করা যায় না। তাই কোনো দিকে না তাকিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মেয়েটিকে তার হাতে তুলে দেয়। বিয়ে করে এই দেশে নিয়ে আসে। দেশে বলে আসা কন্ট্রাক্টরের এই দেশে এসে যখন ইউনিফর্ম পরে কাজে যেতে দেখে মেয়েটির স্বভাবত প্রশ্ন জাগে, তুমি স্বাধীন বানিজ্য করো, তোমার ইউনিফর্ম কেনো? বিভিন্ন বাহানায় বুঝায় একটি পরিচিত লোকের মেয়েকে, যে নিজেও উন্মুক্ত আকাশের যাত্রী। অনেক দিন পরে বের করে এই ইউনিফর্মের রহস্য। মেয়েটি কাজ করতে চাইলে তাকে কাজ করতে দেয় না। সারাক্ষন বাড়িতে বেঁধে রাখার মতো করে রাখে। কোনো অনুষ্টানে যেতে দেয় না। কারো সাথে মিশতে দেয় না। কোনো কারণে বাড়ির বাইরে যেতে হলে বোরকা পরতে বাধ্য করে। মেয়েটিকে শুধু বলতো তুমি নামাজ রোজা করো আমি টাকা আয় করি। উন্মুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠা মেয়েটি হাফিয়ে উঠে। এই জন্য বেশ কয়েকবার তার গায়ে হাত তুলতেও লজ্জা পায় নি। দেশে মেয়েটির মা বাবাকে জানালে তখন ছেলের বাড়ি থেকে হুমকি যেতে থাকে। কি করা । সে এবার ভালো আরবী শিখবে। যেখানে দল বেঁধে শুধু জেনানাদের বেদুঈন শিক্ষা দেয়া হয়। তাই কোনো দেড় হাত লম্বা দাড়ি ওয়ালা দরকার। এই জন্য বাড়ির বাইরে যেতে আসতে, পরিচয় হয় শ্রিলংকার রাভির সাথে। পরিচয়টা ঠিক এই ভাবে, ছেলেটি মনে করেছিল মেয়েটি লংকান, তাই নিজে গিয়ে কথা বলে, এই থেকেই পরিচয়। কোনো একদিন রাভির সাথে কথা বলতে দেখে ফেলে যোশ ওয়ালা। বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করে কে সে? মেয়েটিও উত্তর করে বাংলাদেশী মনে করে কথা বলতে গিয়ে দেখে শ্রিলংকান লোক, এবার আর যায় কোথায়। তুই পর পুরুষের সাথে কথা বললি কেন ? তার পর তার উপর দুর্গা পূজার ঢোল বাজাতে থাকে, পালা করে। ঢোলের বাদ্য সহ্য করতে না পেরে, কয়দিন পরে মেয়েটি রাভির কাছে চলে যায়। গিয়ে তাকে সব বলে। রাভি সব শুনে মেয়েটিকে প্রস্তাব দেয়, তুমি যদি চাও তো আমার সাথে সারা জীবন কাটাতে পারো। এর পর যা হবার তাই হলো। তাদের ছাড়াছাড়ি হলো। রাভির সাথে বিয়ে হলো। সুখে আছে, মোটামুটি ভালো কাজ করে, তাদের দুটি মেয়ে এখন। যোশ ওয়ালারা আর একজন সদস্যা হারিয়ে ফেললো। এত বড় গল্প বলার কারণ ছিল না। কারণ হলো যোশের আচ্ছাদনে আর কত কাল উন্মুক্ত সাধারণ মানুষকে ধরে রাখা যায় তা বলার জন্য এই এই জীবন্ত গল্প।

এবার একটু পেছনের দিকে চলে যাই। দেখি যোশ বাহীনিদের দানবীয় উন্মাদনা। কিছু তথ্য হাজির করলাম । তথ্য সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন সুত্র থেকে। তবে বেশীর ভাগ আমার নিজের উদ্দোগে সংগ্রীহিত। স্থল ভুমির প্রাণী কুলের জন্যই ভুমি, এ কথা চিরন্তন সত্য। তবে যোশ বাহীনির জন্য নাও হতে পারে। এই ভুমি অধিকার প্রয়োগের জন্য যুগে যুগে মানুষ যে লড়াই করেছে তা ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়। আজকে আমি যে বিষয়ে বলতে চাই বাংলাদেশের মোট ভুমির খুব সম্ভবত ১১ ভাগের এক ভাগ স্থল ভুমি নিয়ে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল। ১৯০০ সালের রেগুলেশান আলোচনা করতে মন চায় না। তবুও বলতে হয় বৃটিশ পুর্ব সময়ে পাহাড়ের ভুমির দখল ছিল কিছু সমসাময়ীক নিয়মের উপর। যখন বৃটিশ আসলো তখন তাদের স্বার্থ আদায় করার জন্য হয়তো চলতি নিয়মের উপর হাত না দিয়ে শুধু মাত্র ভুমির মালিকানা নিয়েই তাদের উপনিবেশ সৃস্টি করেন। তখনকার সমসাময়ীক কালের অবস্থা দেখলে পরিস্কার একটি বিষয় ধরা পরে তা হলো ভুমিতে পাহাড়ীদের কিছু কিছু অধিকার থাকলেও মুলতঃ ভুমি প্রশাসনটা ছিল বৃটিশদের হাতে। তবুও সামগ্রীক ভাবে উক্ত অঞ্চলের জনগণ নিজেদের মতো শান্তিতে থাকার যে পরিবেশ সৃস্টি করেছিল তা আজকের জন্য স্বপ্নের জগৎ বলে মনে হয়। রেগুলেশানের মধ্যে ৩৪, ৪৯, ৫১ ও ৫২ ধারা গুলো পড়লে দেখা যায় এই ধারার ৩৪ অনুসারে পার্বত্য অঞ্চলে বহিরাগত বা অ-পাহাড়ীরা ভুমি ক্রয় বা বন্দোবস্তি নেয়া কোনো ভাবেই যাবে না। ৫১ ধারা অনুসারে কোনো অ-পাহাড়ী যদি পার্বত্য মানুষের স্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছে এমন প্রমান হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঐ অঞ্চল থেকে বের করে দেয়ার অধিকার রাখেন ডেপুটি কমিশনার। ৫২ ধারা অনুসারে পার্বত্য গোত্র পতির অনুমতি ক্রমে ডেপুটি কমিশনার অ-পাহাড়ীদেরকে স্বল্প কালের জন্য বসতি স্থাপন করার অনুমতি দিতে পারেন। আর ৪৯ ধারায় পার্বত্য ভুমির অপুর্নাঙ্গ আলোচনা করা হয়। এই সময় পাহাড়ী হেড ম্যানরা ডেপুটি কমিশনারের এজেন্ট হয়ে বিভিন্ন করাদি আদায় করতো বলে জানা যায়। এই কথাটা আমরা জেনে এসেছি মানুষের মুখে মুখে যে , বৃটিশরা পাহাড়ীদের থেকে বেশী কর নেবার লোভে পাহাড়ীদেরকে চাষে উৎসাহ যোগাতে জমি বন্দোবস্ত প্রথা চালু করে, যে সেই জমি নেবে তা তার বংশানুক্রমিক ভাবে ভোগ দখল করে যেতে পারবে। এ ভাবে নেয়া জমি হস্তান্তর করা যেত মাত্র ডেপুটি কমিশনারের অনুমতিক্রমে। এভাবেও একটি বিষয় ছিল যে, কোনো কারণে শর্ত লংঘন হলে উক্ত ভুমিতে জম্মানো ফল মুল গাছপালা ঘরবাড়ী সব কিছুর ক্ষতি পুরন পাওয়া যেত। পার্বত্য ভুমিতে ও জলে পুরোপুরি অধিকার পাহাড়ী মানুষের ছিল। এই শর্তাবলীতে অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না থাকলেও অধিকারে কোনো রকম হস্তক্ষেপ হতো না । অধিক হারে স্বীকৃতি ছিল। সমতল ভুমির সাথে তুলনা করলে civil procedure code আইগত ভাবে না থাকার ফলে পার্বত্য বাসীর ভূমির অধিকার সর্ব ক্ষেত্রে বলবান ছিল। আরো একটা বিষয় না বললেই নয় যে সে সময় বিভিধ কর বা কোর্ট ফি দিতে হতো না। জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে আবাদ যোগ্য জমি বসবাসের স্থান সম্পর্কে বৃটিশদেরকে অধিক ভাবে সজাগ করে তোলে।

কালের পরিবর্তনের ধাপে যখন এছালামী যোশ ওয়ালারা সেইদিন আজকের বাংলা নামের ভুখন্ডের মালিক বনলো তখন কি থেকে কি হয়ে গেল তা গভীর ভাবে না জেনে শুনে

একদল নানা ভাবে নানা কথা বলে বেড়ায়। এই বিষয়ে তাদের ধারণা যে কত স্বল্প তা তাদের লেখা গুলো প্রমান দেয়। হুজুগ দিয়ে মুল সমস্যায় যেমন যাওয়া যায় না তেমন বাস্তব ভিত্তিক কিছু বের ও হয়না কলম থেকে।

১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মানের ফলে লক্ষ লক্ষ স্থানীয় মানুষ গৃহহীন হয়ে পরে, তার সাথে সাথে সহায় সম্বল যা ছিল তাও তলিয়ে যায়। যদিও তৎকালীন সরকার তাদের পুনর্বাসন করার কথা বলে ছিল এবং তাদের আর্থিক সহায়তা দেবার কথা ছিল তার কত টুকু কার্য্যকর হয়েছিল তা এখনো প্রশ্নের মুখোমুখি। কিছু কিছু মানুষকে পুর্নবাসনের নামে কিছু ডি শ্রেনীর ভুমি দেয়া হয়। আর আর্থিক সহায়তা যেটা দেবার কথা ছিল তাদের শতকরা ৬% কিঞ্চিত সহায়তা পায়। এই সহায়তা হাসিল করতে সেই সময়ের কম করে আট থেকে দশ বছর লেগে যায়। কিন্ত বাকীদের কি হবে ? বাকীদের কি হয়েছিল তার খবর কি কেউ রাখে? পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানী রাজাকার বাহীনি ও বাংলার তখনকার নব্য গজানো রাজাকারের দোসরেরা মিলে সুকৌশলে ১৯৬২ সালে সংবিধানে পাহাড়ীদের পৃথক অঞ্চলের সাশন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে উপজাতীয় অঞ্চল করে সর্ব প্রথম পার্বত্য রেগুলেশান সংশোধন করে। কিন্ত পার্বত্য ম্যানুয়েল নামের আইনের বিভিন্ন ধারা সম্বলিত নিয়মে ৫২ বিধি থাকা সত্বেও পাকি সরকার ও তাদের দোসরেরা পাহাড়ে সেটেলার পাঠাতে থাকে বসবাস করার জন্য। কোন একটি কাজে একটি উল্লেখযোগ্য মামলার কপি সংগ্রহ করতে হয়েছিল। তাতে দেখা যায় ১৯৬৫ সনে আনছারী বনাম ডেপুটি কমিশনার মামলায় পুর্ব পাকিস্তানের হাই কোর্ট ৫১ বিধি সংবিধান বিরোধী বলে রায় দেয়ায় সেই বিধি সরকারী ভাবে তুলে নেয়া হয়। দেখা যায় বাংলার মানুষ কোনো কালেই পার্বত্য বা সমতল ভূমির সংখ্যালঘুর পাশে ছিল না । পয্যায় ক্রমে সুযোগ খোজতে থাকে নিরীহ মানুষের মুখের ভাত কেড়ে নেবার জন্য। তার ফল আজকে প্রতিদিন প্রমান দেয়। পার্বত্য অঞ্চলে প্রকৃত ভূমির পরিমান কত তা আজো সন্দিহান। কারণ কোন কালেই জরিপের কথা শুনিনাই। তবে কিছু কিছু সরকারী কাগজে পত্রে যে জরিপের কথা উল্লেক আছে তা শুধু মাত্র ভুয়া মিথ্যা বানোয়াট ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা অনুমানের উপর ভিত্তি করে মন গড়া এক কিচ্ছা। আনছারী মামলায় ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে পাকি সরকার তখন ৩৪ ধারা সংশোধন করে লিখে দেয় যারা পার্বত্য অঞ্চলে ১৫ বছর ধরে আছে তারা বসবাস করতে পারবে। কিন্ত আমার কথা হলো এই ভূমি কোথা থেকে আসবে তাদের জন্য ? তার চিন্তা কেউ করে নাই। পাকিদের নিয়ন্ত্রনের নমুনা ধরে পাকিদের গোলামেরা আজো তা একই সুত্রে করে যাচ্ছে । যে কথা একটু আগে শুরু করেছিলাম, কাপ্তাই বাঁধ নির্মানের ফলে যে মানুষ গুলো ভূমি হীন অসহায় হয়ে পরেছিল তার সুষ্ট সমাধান আজ পয্যন্ত হয়নি। বাঁধের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে প্রথম শ্রেনীর যে জমি গুলো (যে গুলোয় চাষাবাদ করা যায়) পানির নীচে চলে যায় তার পরিমান বিভিন্ন সুত্র বিভিন্ন সংখ্যা উপস্থাপন করে থাকে। এই সমস্যা ও সংখ্যা নিরুপনে খুব সম্ভবত কানাডিয়ান ফরেস্টাল কোং নামক এক সংস্থা ১৯৬৩ বা ৬৪ সালের দিকে জরিপ চালিয়ে প্রায় ৬০,০০০ একর জলাবদ্ধ হয় বলে তথ্য দেয় আর এই সমস্যায় পতিতের সংখ্যা দাড়ায় প্রায় শতকতা ৫৮% ভাগ মানুষ। এই কোম্পানীর দেয়া তথ্য ভুল প্রমান করতে তৎকালীন পাকিরা নিজেরা জরিপের নামে কিছুটা খোজ খবর নিতে থাকে, আর এই খবরের হাওয়া ভেষে আসে ৫৮% নয় ৪০% বলে চালাতে

থাকে। অথচ কানাডিয়ান প্রতিস্টান যে ভাবে জরিপ চালিয়ে মোট ভূমির সংখ্যা উল্লেক করে তা কিন্ত পাকিরা উল্লেক করতে পারে নাই।(সেই সময়ের কিছু দৈনিকী সুত্র ও পরবর্তিতে বেশ কিছু এই বিষয়ে লেখকের সুত্র) উল্লিখিত কোং ভুমিকে চার ভাগে ভাগ করে । তাদের মতে এ, বি, সি, ডি গ্রেডের ভুমি নির্ধারণ করেন। এই এ শ্রেনীর ভুমির পরিমান ছিল ১০৪৩০৯.৬৪ একর যাহা কৃষি সহ সব কাজের যোগ্য। বি শ্রেনীর পরিমান ছিল ৯৩৫২৫.৫৫ একর যা ফল সবজী ফলানো যায় তবে কিছুটা সমতল করলে চাষ ও করা যাবে। সি এর জমির পরিমান ছিল ৫০৫২২২.৭০ একর শুধু মাত্র সবজী ও কিছুটা বনায়ন করার মতো। ডি শ্রেনীর জমির পরিমান ছিল ২৫০৯৮০১.৪০ একর যা শুধু মাত্র বনায়নের যোগ্য। আর এর ফলশ্রুতিতে সেই মানুষ গুলো সামাজিক রাজনৈতিক আর্থিক ভাবে বিপদে পরে। প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প ভূমি তার উপর বাঁধের জন্য জলামগ্নতায় সহায়নীন ভূমিহীনেরা কোথায় যাবে, কি করবে কি খাবে তার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। আলোচনার জন্য বলছি, এছালাম যদি শান্তি হয় তা হলে এই যে কাপ্তাই বাঁধের জন্য লক্ষ পাহাড়ী বাস হীন হলো সহায় সম্বল হীন হলো তখন তাদের শান্তি কোথায় ছিল ? তখন তাদের ধর্ম কোথায় ছিল ? জানতে চাই, কিন্ত এমন কোনো প্রাণী বের হয়না যুক্তির সাথে কিছু বলার জন্য, শুধু পাওয়া যায় একদল মোল্লা জন্ত।

যারা পার্বত্য সংখ্যালঘু সমস্যা রাজনৈতিক বলে মনে করে থাকেন তা রাজনৈতিক দৃস্টিকোন থেকে দেখতে চাইলে দেখা যায় , ১৯৭৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে সেনাবাহীনিরা এক জনসভা করে। এই জনসভায় সেই সময়ের চট্টগ্রামের এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মঞ্জুরের বক্তব্যে পরিস্কার ভাবে পার্বত্য জনগণকে হুসিয়ারী দেয় যে "আমরা তোমাদের চাই না, তোমরা যেখানে খুশি সে খানে চলে যেতে পারো, আমরা তোমাদের মাটি চাই" একই রকম অন্য একটি জনসভা হয় ১৯৭৯ সালের ২৬শে মে পানছড়িতে। এই সমাবেশেও সেই সময়ের ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ (এই লোক একবার মন্ত্রী হয়েছিল) ও লেঃ কর্নেল সালাম দুই জনে মিলে ঘোষনা করে যে " আমরা শুধু এ দেশের মাটি চাই, পার্বত্য জনগণ চাই না"। দেখাজায় যারা সংখ্যালঘুদের নিপীড়নের কথা বলে তারা পরবর্তীতে দেশের নেতা হয়, এই তাদের ভোট দেয় কারা? নিশ্চয় সংখ্যাগুরু মৌলবাদী যোশ ওয়ালারা নয় নি !!! এই সুত্র পেয়ে বাঙ্গালী সেটেলার বিশেষ করে যোশ বাহীনি ধীরে ধীরে প্রচারনায় থাকে যে পাহাড়ীরা হয়তো দেশ ত্যাগ করো নয়তো এছালামী যোশ বাহীনি হয়ে যাও। এই সময় পার্বত্য মানুষ প্রতিক্ষনে নিজেদের প্রাণ হাতে নিয়ে চলা ফেরা করার মতো করে বাড়ী থেকে বের হতো। কোনো কারণ ছাড়াই হাজার হাজার পার্বত্য মানুষ অত্যাচার উৎপিড়ন নিপীড়নের শিকার হয়। আর এ জন্য আইন ছিল না পাহাড়ীদের জন্য। কোনো বিচার ব্যবস্থা ছিল না যে সেখানে গিয়ে একটু নালিশ করতে পারে। ১৯৮০ সালে জিয়া পার্বত্য নেতাদের সাথে বৈঠকে বসে, বৈঠকে নেতারা পার্বত্য অঞ্চলের স্বায়ত্ব সাশন দাবী করলে জিয়া পরে উত্তর দেবে বলে বৈঠক শেষ করে। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সাল পয্যন্ত হাজার হাজার হত্যা, ধর্ষন লুট, দখল, উচ্ছেদ, ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা, ভাংচুর অগ্নিসংযোগ সহ নানা রকম নির্যাতন চালাতে থাকে । এই অত্যাচারের যে গুলো বড় আকার ধারণ করে সে গুলো বাংলাদেশের কাগজ গড়িয়ে বিদেশের কাগজে ও চলে যায় । এক পর্য্যায়ে বিদেশী কিছু পত্র পত্রিকা

কর্মী বাংলাদেশের প্রশাসনের লোকদের কাছ থেকে সাক্ষাতকার নিতে আসে। এমন একটি ঘটনা , ২৯শে জুলাই ১৯৮১ সাল। The Guardian পত্রিকা জিয়ার সাক্ষাতকার নিতে গেলে পর পর বেশ কয়েকটি প্রশ্ন সে উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। পার্বত্য বিষয়ে জিয়া যে কথাটি বলে তা সেই কাগজে যে রকম লেখা ছিল তার অনুরুপ তুলে ধরছি -

" We are doing some wrong there. We are being unfair to the tribes. It is a political problem that is being dealth with by police and army action. Yet it can be settled politically very easily. We have no bassis for taking over these lands and pushing the tribes into a corner. We should at least call a meeting of these tribal leaders and ask them their demands". যে প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিতে অপারগতা জানায় তা ছিল স্বাধীনতার শত্রু রাজাকার পুনর্বাসন, রাজনৈতিক সমস্যা যদি হয় ধর্মীয় ভাবে কেন পাহাড়ীদের নির্যাতন করা হচ্ছে, এবং সামরিক লোক জন দ্বারা উস্কানি দিয়ে পাহাড়ীদের অধিকার হরনের কারণ, সমতল ভূমির মানুষের জন্য যদি কিছু করার ইচ্ছা থাকে তো তাদের সমতল ভূমিতে কেন করা হচ্ছেনা, দিনে দিনে ধর্মীয় উগ্র মৌলবাদীতা বৃদ্ধির কারণ, এবং ১৯৮০ সালে অথাৎ গত বছর পাহাড়ী নেতাদের সাথে বৈঠকের কথা স্বীকার না করার কারণ যা সেই সময়ের কাগজের উদাহরন দিয়ে জানতে চাইলে জিয়া প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। ১৯৭৭ ও ১৯৭৯ সালের সামরিক জনসভা ও জিয়া কতৃক সাক্ষাতকার দেয়ার দলিল গুলো আমার মনে হয় প্রতিটা সচেতন পাহাড়ী মানুষের কাছে এখনো সংরক্ষিত আছে। তাছাড়াও এই সুত্র বিভিন্ন লেখাতেও অনেক বার প্রকাশ হয়েছে। শুধু পাহাড়ী নয়, আমি বাংলাদেশের সব সংখ্যালঘুর কথা এখানে তুলে ধরতে চাই। বাংলাদেশে আজকের দিনটি পয্যন্ত যত সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে তার শতকরা ৯৯.৯৯% ভাগই উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনার ফল। এই ধর্মীয় উন্মাদনা বৃদ্ধির পেছনে রাষ্ট্র তথা দেশের সংখ্যাগুরু জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত। সচেতন মহলের কাছে আমার অনুরোধ, শুধু মাত্র গত ১২ বছরের বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষা পটে মাত্র এক যুগের বিচার বিশ্লেসন করার জন্য। দেখা যায় সব কয়টি সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় শারীরিক মানসিক সম্ভ্রম উচ্ছেদ সহ যাবতীয় নির্যাতনের কারণ একমাত্র ধর্মীয় পরিচয়। মুসলিম রাজনীতি মুলতঃ ধর্মীয়। আর এই বিষ ফল ভোগ করে নীরিহ সংখ্যালঘু জনগণ।

২৫শে মার্চ ১৯৮০ সাল। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালি থানার কলমপতি ইউনিয়ন। এখানেই একটি পাড়ার নাম পোয়াপাড়া। এই পোয়াপাড়া বৌদ্ধ মন্দির মেরামতের নামে সে দিন স্থানীয় বৌদ্ধ জনগণকে ডাকা হয় সামরিক বাহীনির লোক দ্বারা। এই সময় কামাল নামের এক ক্যাপ্টেন উপস্থিত সবার উপর গুলি ছোড়ার নিদ্দেশ দেয়। এতে ঘটনাস্থলে মারা যায় পাঁচশতাধিক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ। একই সমেয়ে শুরু করে সেটেলার বাঙ্গালী মুসলিম ও সেনাবাহীনি জৌথ ভাবে আল্লা আকবর ধ্বনী দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় হত্যা ধর্ষন লুঠ ঘরবাড়ী জ্বালানো বৌদ্ধ মন্দির লুঠ এবং যাহা খুব জঘন্য ভাবে করা হয় তা ছিল ধর্ষন। যত টুকু মনে পরে রাশেদ খান মেনন ও আরো কয়েকজন মিলে সেই

এলাকা দেখতে গিয়েছিল। সরকার কোন তদন্ত করলো না। সেই সময়ে সংসদের কিছু সদস্য বলেছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমস্যা হবেই। সুত্র যে ভাবে শুরু হয়, কিছু সেটেলার বাঙ্গালী মুসলিম কোনো এক গরীব পাহাড়ীর জায়গা দখল করতে যায়। পাহাড়ী কিছু মানুষ কতৃক বাধা পেলে তারা আর্মির কাছে নালিশ করে। আর্মি বেশ কিছু দিন নিরব থেকে একটা কারণ খুজতে থাকে, আর সেই কারণ দেখায় পাহাড়ীদেরকে বৌদ্ধ মন্দিরে ডেকে এনে হত্যা করা। কেন হবে তার কারণ জানতে চাওয়া আমার কি অপরাধ হবে ? আমি যদি কোনো বিচার না পাই, আমার ও আমাদের উপর অত্যাচারের কারণ কি জানতে চাই তা কি অন্যায় হয় ? ধর্মীয় মৌলবাদী বাংলাদেশের মানুষ দশকের পর দশক ধরে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর সরকারী ছত্রছায়ায় নির্যাতন করা কি তাদের ধর্মীয় বিধি? যে এলাকায় এই ঘটনা ঘটিয়ে ছিল সেই গ্রামে আজ মসজিদ কেন, যদি রাজনৈতিক হয় সব কিছু?

উপরোক্ত ঘটনার পরে জিয়া সরকার দূর্গত এলাকা বিল নামে এক বিল আনে , যে বিলে কোনো আর্মি ইচ্ছা করলে যে কাউকে সন্ধেহ ভাজন বলে গুলি চালাতে পারবে বা গ্রেপ্তার করতে পারবে। যে কাউকে তল্লাসী করতে পারবে, অস্ত্র মজুদ করার সন্ধেহে যে কোনো বাড়ী পোড়াতে পারবে। বসত থেকে তুলে দিতে পারবে। তার জন্য কেউ আদালতে যেতে পারবে না।

এতো গেলো রাজনৈতিক কথা , যারা রাজনীতির গন্ধ পায় তাদের জন্য, কিন্ত রাজনীতির লোকেরা যখন আমার বাড়ী জ্বালাতে ও নানা বিধ অত্যাচার করতে আল্লার নামে আমাকে অত্যাচার শুরু করে তারা কারা ? এরা বোধহয় সবলরা দুর্বলদেরকে অত্যাচার করে যারা তারাই। তো এই সবলরা কারা ? যোশ বাহীনি নামের এছালামী সৈন্যরা নাকি বেদুঈনেরা ???

পার্বত্য অঞ্চলে এই পয্যন্ত যত ঘটনা হয়েছে তার প্রতিটিই হয়েছে মুলত ভূমি সংক্রান্ত। সামান্য কিছু সমস্যা সৃস্টি হয়েছে অন্যান্য কারণে। যে মানুষ দিনের পর দিন বছরের পর বছর যুগের পর যুগ শতাব্দির পর শতাব্দি যে ভূমি ভোগ করে আসছে তারা মালিক না হয়ে সে ভূমির অন্যেরা মালিক কি করে হয় তা জানতে চাওয়া নিশ্চয় অপরাধ হবে না।

অনেক পন্ডিত লেখক তো দেখা যায় , তাদের কাছে আমি একটি কথা বলতে চাই, তারা আমাকে এই কয়টি ঘটনার সুত্র দিতে পারলে খুশি হতাম। এই কয়টি ঘটনার মধ্যে ১৯৮০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর রাঙ্গুনিয়া থানার রাইখ্যাবিল বেতবুনিয়া ইউনিয়নের বাউরা পাড়ায় ২৮শে সেপ্টেম্বর, লংগুদুতে ১৯শে নভেম্বর, ডিসেমরের ১১ তারিখে নোয়া পাড়া ও কারবারী পাড়ায় তারপর দাতদুপ্যারে ২৩শে ডিসেম্বরের ঘটনার কথা কেউ কি জানেন ? এই হত্যা কান্ডগুলো মানব সমাজের জন্য এক কলঙ্কময় অধ্যায় হয়ে আছে। পাহাড়ের মানুষ গুলো আজো বেঁচে আছে, কিন্ত ভুলেনি তারা যোশ বাহীনির কথা।

বাংলাদেশে পার্বত্য অঞ্চলে যে হারে ভূমি সমস্যা দেখা দেয় তা বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুষারে দেখলে দেখা যায় প্রায় এক শতাব্দিতে কি পরিমান পার্বত্য মানুষের উপর নির্যাতন ও দেশ ছাড়া করা হয়েছে। এই সমস্যাকে সামাজিক হিসেবে ধরে নিলে প্রথমে যে বিষটি আসে তা এই অধিবাসীতে জীবন যাপন থেকে দিনের প্রতিটি কাজে বিরাট এক ব্যবধান। পরিস্কার করে বলতে গেলে এক শ্রেনীর বাংলা লেখিয়ে কিছু কিছু লেখায়

নিলজ্জ ভাবে কোথাও কোথাও লিখে ও ফেলেছে যে তারা কচু খায় ঘেচু খায় এই খায় সেই খায় তাই তারা পাহাড়ী। কিন্ত প্রতিটা অঞ্চলের মানুষের মাঝে খেয়াল করলে দেখা যায় কিছু না কিছু আঞ্চলিক প্রভাব আছেই। তা ক্ষণ কালের শিক্ষিত বাঙ্গালী এখনো বুঝে উঠতে পারেনি। একটু ভিন্ন দৃস্টি দিয়ে দেখে বললে বলতে হয় স্কুলে গিয়ে পাশ দিয়ে শিক্ষিত হওয়া যায় খুব সহজে, কিন্ত মনের আলোয় শিক্ষিত হওয়ার জন্য আজকের ক্ষণ কালে গজিয়ে উঠা শিক্ষিত মুসলিম বাঙ্গালীকে হয়তো আরো গোটা এক শতাব্দী কাটাতে হবে। আমার দেখা একটা ঘটনা বলি, আমি সবে মাত্র যুবক। বিঝু অনুস্টান হবে কোনো এক মাঠে। সন্ধ্যার দিকে অনুস্টানের শুরু হয়। শিশু তরুন তরুনীরা কেউ কেউ গান নৃত্য নিয়ে মঞ্চে আসতে শুরু করলো। সেই অনুস্টান দেখতে গিয়েছিল কিছু আর্মির লোকজন ও কিছু সাধারণ বাঙ্গালী। আমি জেখানটায় বসে ছিলাম সেখানে আরো কয়েকজন আমার বন্ধু ছিল। তার একটু সামনেই আর্মির লোকজন ও কিছু পার্বত্য সিনিয়র লোক বসেছিলেন। আমার খুব কাছের সামনের আর্মির বৌ বলে উঠলো আরে এই গুলা দেখার কি আছে, আমরা ঢাকায় যা করি তা কি এই পাহাড়ের পাহাড়ীর দ্বারা করা সম্ভব ? আর্মিটা বলে উঠলো সময় কাটানোর তো আর কোনো জায়গা নাই। তাই না পারতেই তো তোমাকে নিয়ে আসলাম। এমন সব কথা বলা শুরু করলো তারা সে গুলো শুনে খুব সাধারণ মানুষের গায়ে ও আগুন ধরে যাবার কথা। সেখান থেকে উঠে অন্য খানে বসলাম। এবার সেখানে আমাদের ডান পাশে কিছু বাঙ্গালী মহিলা ও কিছু পাহাড়ী তরুনী। তারা পাহাড়ী তরুনীদের কাছথেকে জানতে চায় তোমরা এই অনুস্টান কি জন্য করছো? মেয়ে গুলো বললো তোমরা যেমন পয়লা বৈশাখ করো আমরাও বিঝু করি। তারা বলে উঠলো এক দেশে দুই রকম কেন, তোমরাও আমাদের মতো পয়লা বৈশাখ করতে পারো না? সেই তরুনীরা বললো আমরা পুরানো ঐতিহ্যের ধারা হিসেবে আমাদের সামাজিক অনুস্টান করছি। যেমন আপনারা করেন। আমার সেই বয়সে সেই কথা আমার মুখ দিয়ে বের হবার কথা নয়, তবুও আমি মাঝখান থেকে বলে উঠলাম প্রত্যেককে তার নিজের মতো করে বাঁচতে দিন না। তাতে কি এমন ক্ষতি আপনাদের ? আপনাদের কাজে তো কোনো পাহাড়ী বাধা হয়ে দাড়ায় না, আপনারা আমাদের অনুস্টান দেখতে এসে আমাদের নিয়ে সমালোচনায় কেন ? তা যদি মানতেই না পারেন তো শুধু শুধু আসলেন কেন ? আর আপনাদেরই সময় বা কেন নস্ট করলেন? আমার এই কথা বলার পর সেখান থেকে এক মহিলা আমাকে বলে উঠল এই ছেলে তুমি কে ? তুমি কে ? তুমি জানো আমি আর্মি অফিসারের ভাগ্নী ও আমার বাপ পাহাড়ের অমুক এলাকার চেয়ারম্যান ? আমি বললাম পাহার আমার, আর আমার পাহাড়ে আপনী উড়ে এসে জুড়ে বসে আমার উপর লাঠি ঘুরাচ্ছেন। আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত নয় কি ? কথাটা বলে আমি সরে পরলাম। কারণ কে জানে কোন দিক থেকে আমাকে ধরে নিয়ে অন্যদের মতো আমাকেও মেরে ফেলে। আমার অনুস্টান আমি শান্তিতে দেখতে পারলাম না। সেদিন ভাবিনি, সেই কথা আমাকে আজকে এত বছর পরে লিখতে হবে। হাজার বলছি না, শত শত ঘটনার কথা বলে ও আমি শেষ করতে পারবো না। কিন্ত আমি বিঝু নিয়ে এই মাত্র যে কথাটা বলেছি তা নিয়ে একটি মন্তব্যে আসলে কেমন হয় ? দেখুন আমার সাথে একমত হতে পারেন কিনা, তবে আগে ভাগে বলে নেই, যোশ ওয়ালাদের একমত হবার তো কথাই আসে না।

যে মহিলা গুলোর সাথে সে দিন আমার কথা হয়েছিল সে মহিলা গুলো কারো বৌ কারো মা। কারো বোন। সে দিন প্রতিবেশীর আঙ্গিনায় গিয়ে যে প্রতিবেশীর সমালোচনায় মুখর ছিল সে বা তারা তাদের ছেলে মেয়েকে কি শিক্ষা দিয়েছে বলে আপনাদের মনে হয় ? আশাকরি ভালো শিক্ষা দিতে পারেনি। তারাই আজকে আমাদেরকে মারছে, কাটছে, ভুমি হীন করছে, তাই নয় কি ??? নেটের জগতে সবাই তো শালীন সাজে। আমি ভাই শালীন বা অশালীন কিছুই সাজতে পারি না, মানুষের পাশে বসবাস আমার, নব্য কোন হি-ক্ষিত ও নই। যা বলি সামনা সামনি বলি, যা রুপ তা খুলে দিই। তাই আমিই খারাপ না হয়ে হবেটা কে ??? আমার লেখার শালীনতা থাকবে কোথা থেকে ??? ঐ যে বলেছিলাম বাস্তব রুক্ষ হয়। মেনে নিতে যাদের কস্ট হয় ধরে নিতে হবে তারাই যোশ ওয়ালা। যাক, কথার ফাকে অনেক কথা এসে যাচ্ছে। আমি এবার একটু অন্য আলোচনা করি।

আজ থেকে শ'খানেক বছর পেছনে গিয়ে দেখি। পর পর তিনটা লেখায় দেখলাম ১৯১১-১৯২১ সালে পার্বত্য এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১২.৮% । ১৯৩১ সালে তা বেড়ে হয় ১৩%। ১৯৪২ সালে ১৬%। ১৯৫০ সালে ১৬.৫%। ১৯৬১ সালে ৩৫%। ১৯৮১ সালে বেড়েগিয়ে ৪৭% কিন্ত সেই বছর বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ১১.৮১%। কথা প্রসঙ্গে বলতে গেলে এই বৃদ্ধি যদি পার্বত্য মানুষের হতো তবে সে এলাকায় অন্য মানুষের বসবাসের জায়গার কথাই আসে না। এরা কারা ? আর একটা তথ্য দেখা জাক , বৃটিশ এর শেষ সময়ে পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ী ও অ-পাহাড়ীদের অনুপাত ছিল ৯৭.৫% ও ২.৫% । নব্য পাকিস্থান হয়ে সে অনুপাত এসে দাড়ায় ৯১% ও ৯%। ১৯৬১ সালের দিকে ছিল ৮৮% ও ১২% । ১৯৮১ সালে এসে ৫৯% ও ৪১% হয়। আবারও আমার প্রশ্ন, আমার ভূমিতে এরা কারা ? এরা কি ভাবে আমার এই জমি পেলো? নিশ্চয় আমার কাছ থেকে জোর দখল করে নেয়া হয়নি কি ? আর অন্য বিষয়টা হলো, এটা রাজনৈতিক। রাজনৈতিক জদি হয় তবে কোনো এক জাতী গোস্টির উপর কোনো দেশের সরকার চড়াও কেন? এই সরকারে যারা তারা কারা ? নিশ্চয় যোশ ওয়ালা জন্তরা। পাহাড়ে যখনই একটু সমস্যা হয় তখনই যোশ ওয়ালা জন্ত ও আর্মী একসাথে ঝাপিয়ে পরে আমার নিরিহ মানুষের উপর। তারা আল্লার নামেই শুরু করে আমাকে নিধন। আমাদের উপর, যারা আল্লা আকবর করে করে আগুন অস্ত্র সহ বিভিন্ন ভাবে সজ্জিত হয়ে আমাদের উচ্ছেদ করে তারা কারা? তো শেষ লাইনে দেখা যায় সবই যোশ বাহীনির উলঙ্গ বর্বরতা। যেখানে তাদের ধর্মীয় গোস্টি বৃদ্ধির উন্মাদনায় আমাদেরকে উৎখাত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মুসলিম মানেই আল্লা। শতকরা ৯৫ জন বেচে থাকে আল্লা নিয়ে । এই আল্লাই তাদের ধর্ম রাজনীতি সমাজনীতি । তাদের প্রাত্যহিক জীবনে আল্লার ব্যবহারে পিষেমরে আমাদের মত সাধারণ সংখ্যালঘু। এতে আল্লাবাদী জন্তদের এছালামী যোশ ওয়ালা জন্ত বললে একদল মোল্লা মুল্লি খেপে যায়। তখন বুঝতে পারি আমি নিজে অথবা যারা বুঝতে পারে যে , একদল ধর্ম ব্যবসায়ীদের আসল চরিত্র তাদের নিজেদের অজান্তে মানুষের কাছে ফুটে উঠে।

আমার যত টুকু মনে পরে পাহাড়ী বাঙ্গালীর মাঝে ভয়াবহ দাঙ্গার সৃস্টিহয় ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে। তার আগেও যে হয়নি তেমন নয়। এর আগে যে অত্যাচার গূলো হয়েছিল

তা কিছুটা ছোট আকারের ছিল। পরবর্তী লেখায় শুধু এই বিষয়েই লিখবো বলে ভেবেছি। আজকে লেখা এই খানেই শেষ করতে হবে।

পৃথিবীর সবাই সুখী হোক , শান্তীতে থাকুক।

১১/১০/২০০৩